

শারহুল আক্বীদা আত-ত্বাহীয়া

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ৩৩. নিশ্চয়ই কুরআন আল্লাহর কালাম, যা আল্লাহর নিকট থেকে কথা হিসেবে শুরু হয়েছে, তবে এর কোনো ধরণ নির্ধারণ করা যাবে না।

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ইমাম ইবনে আবীল ইয় আল-হানাফী (রহিমাল্লাহ)

আল্লাহর কালামের ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মাযহাব এবং বিরোধীদের জবাব - ৩

আর যারা বলে আল্লাহর কালাম বলতে মাত্র একটি অর্থকেই বুঝায়, তাদের জবাবে বলা হবে, তাহলে মুসা আলাইহিস সালাম কি পূর্ণ অর্থটি শুনেছেন? না কি তার আংশিক শুনেছিলেন? তারা যদি বলে তিনি সমস্ত কালাম শুনেছেন, তাহলে আসলে এ ধারণাই করল যে, তিনি আল্লাহর সমস্ত কালাম শুনেছেন! এ কথা যে ভুল, তা সুস্পষ্ট। আর যদি বলে, তিনি আংশিক কালাম শুনেছেন, তাহলে তার জন্য এটি বলা আবশ্যিক হবে যে, আল্লাহর কালামের অংশ ও শ্রেণী বিন্যাস হয়। এমনি আল্লাহ তা'আলা যার সাথে কথা বলেছেন কিংবা যার নিকট তার কালাম থেকে কিছু নাযিল করেছেন, তার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। আল্লাহ তা'আলা যখন ফেরেশতাদেরকে বললেন,

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

“আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করবো” (সূরা বাকারা: ৩০) আর যখন তিনি তাদেরকে বললেন,

اسْجُدُوا لِآدَمَ

“তোমরা আদমকে সিজদাহ করো” ইত্যাদি সব মিলে অনুরূপ কথা কি আল্লাহর সমস্ত কালাম অথবা উহা কি তার কালামের অংশ বিশেষ? তারা যদি বলে এটিই আল্লাহর সমস্ত কালাম, তাহলে এটি অহংকার ছাড়া অন্য কিছু নয়। আর যদি বলে, আংশিক শুনেছেন, তাহলে তাদের মতেও আল্লাহর কালামের আধিক্যতা, বিভিন্নতা ও বহুত্ব প্রমাণিত হয়। লোকেরা সাধারণভাবে[16] কালামের ব্যাপারে চারটি কথা বলেছে।

(১) শব্দ এবং তার অর্থ মিলেই কালাম হয়। উভয়ের একটি থেকে অন্যটিকে আলাদা করে বুঝার কোনো সুযোগ নেই। যেমন দেহ ও রূহের মিলিত রূপকেই মানুষ বলা হয়। এটিই সালাফদের কথা।

(২) শুধু শব্দকেই কালাম বলা হয়। অর্থ শব্দের অংশ নয়। বরং অর্থ হলো তাই, যা কালাম থেকে বুঝা যায়। এটি একদল মুতাযেলা এবং অন্যদের মত।

(৩) শুধু অর্থকেই কালাম বলা হয়। আর মানুষের মুখ থেকে যে শব্দ ও আওয়াজ বের হয় তাকে কালাম বলা হয় কেবল রূপকার্থে। কেননা শব্দই অর্থের প্রতি নির্দেশনা প্রদান করে। এটি ইবনে কুল্লাব এবং তার অনুসারীদের কথা।

(৪) কালাম শব্দ ও অর্থের যৌথ নাম বিশেষ। অর্থাৎ কখনো শুধু শব্দকে কালাম বলা হয়। আবার কখনো শুধু অর্থকেই কালাম বলা হয়। এটি পরবর্তী যুগের কুল্লাবিয়া সম্প্রদায়ের কতিপয় লোকের মত। কুল্লাবীয়াদের পঞ্চম আরেকটি মত রয়েছে। আবুল হাসান আশ'আরী রহিমাল্লাহ থেকেও এ কথা বর্ণনা করা হয়। তা এ যে, রূপকার্থেই কেবল আল্লাহর কালামকে কালাম হিসাবে নামকরণ করা হয়। আর বনী আদমের কালাম হলো প্রকৃত

কালাম। কেননা বনী আদম কথা বলার সময় যে অক্ষরগুলো উচ্চারণ করে, তা তাদের সাথেই প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং যে কথা বলে, সে ব্যতীত অন্য কারো সাথে তার কালাম প্রতিষ্ঠিত হয় না। তবে আল্লাহর কালাম এর ব্যতিক্রম। কুল্লাবীয়াদের মতে কালাম আল্লাহর সত্তার সাথে প্রতিষ্ঠিত হয় না। সুতরাং কুরআন আল্লাহর কালাম হওয়া অসম্ভব। এ বিষয়টি যথাস্থানে আলোচনা করা হয়েছে।

যারা বলে আল্লাহর কালামের মাত্র একটি অর্থ, যা তার সত্তার সাথে প্রতিষ্ঠিত, তারা আখতালের এ কবিতা দিয়ে দলীল পেশ করেছে।

إِنَّ الْكَلَامَ لَفِي الْفُؤَادِ وَإِنَّمَا... جُعِلَ اللَّسَانُ عَلَى الْفُؤَادِ دَلِيلًا

নিশ্চয়ই প্রকৃত কালাম কেবল অন্তরেই থাকে। অন্তরের মধ্যে যে কালাম বা তার অর্থ বিদ্যমান রয়েছে জবান কেবল তাকে ব্যাখ্যা করে মাত্র। এ কবিতার দ্বারা কুরআন আল্লাহর কালাম না হওয়ার দলীল পেশ করা ভুল। কোনো দলীল গ্রহণকারী যদি বুখারী ও মুসলিমের হাদীছ দ্বারা দলীল গ্রহণ করে, তাহলে এরা বলে, এটি হলো খবরে ওয়াহেদ বা একক ব্যক্তির বর্ণনা। যদিও আলেমগণ তাকে সর্বসম্মতিক্রমে সত্যায়ন করেছেন এবং সে অনুযায়ী আমল করার জন্য তাকে কবুল করে নিয়েছেন।

সুতরাং একজন কবির কবিতা দলীল হিসাবে পেশ করে কিভাবে বলা যেতে পারে যে, প্রকৃত কালাম হলো যা অন্তরের সাথে লাগানো থাকে; জবান থেকে যে কালাম বের হয় তা প্রকৃত কালাম নয়! আরো বলা হয়েছে যে, এটি মূলতঃ আখতালের কবিতা নয়। বিদ'আতীরা এটি তৈরী করে তার নামে চালিয়ে দিয়েছে। তার কাব্যগ্রন্থে এটি পাওয়া যায়নি। কেউ কেউ বলেছেন, উপরোক্ত শব্দে কবিতাটি সঠিক নয়; বরং সঠিক রূপ হলো এ রকম, إِنَّ الْبَيَانَ لَفِي الْفُؤَادِ নিশ্চয় প্রকৃত বর্ণনা হলো, যা অন্তরে থাকে। এটিই সঠিক হওয়ার অধিক নিকটবর্তী। আর যদি ধরেও নেয়া হয় যে এটি আখতালের কবিতা, তাহলেও তার কথা দ্বারা দলীল গ্রহণ করা জায়েয নেই। কেননা সে ছিল খৃষ্টান। কালামের মাস'আলায় তারা বিভ্রান্ত হয়েছে। তারা মনে করেছে, ঈসা আলাইহিস সালাম স্বয়ং আল্লাহর কালাম। তারা বলেছে লাহুত নাসুতের সাথে মিলে একাকার হয়ে গেছে।[17]

উলুহীয়াতের কিছু অংশ মানুষের কিছু অংশের সাথে মিশে গেছে। সুতরাং যে নাসরানী স্বয়ং কালামের মাস'আলায় গোমরা হয়েছে, কালামের সংজ্ঞা বর্ণনায় কিভাবে তার কথাকে দলীল হিসাবে পেশ করা যেতে পারে এবং আরবদের ভাষায় কালামের সর্বজন বিদিত অর্থকে পরিহার করা যেতে পারে? আরো বলা যেতে পারে যে, এ কবিতার অর্থ সঠিক নয়। কেননা এর দাবি হলো বোবাকেও মুতাকাল্লিম বলা আবশ্যিক। কেননা তার অন্তরেও কালাম যুক্ত আছে। যদিও সে কথা বলেনি এবং তার থেকে কোনো কথা শুনা যায়নি। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা যথাস্থানে করা হয়েছে। এখানে শুধু ইঙ্গিত করা হলো।

এখানে একটি আশ্চর্যের বিষয় হলো, যেসব নাসারা বলে লাহুত এবং নাসুত মিলে গেছে এবং ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর স্থলাভিষিক্ত হয়ে কথা বলেছেন, তাদের কথার সাথে আশায়েরাদের কথার খুব মিল রয়েছে। কেননা আশায়েরাগণ বলে থাকে যে, আল্লাহর কালাম বলতে ঐ অর্থ উদ্দেশ্য, যা তার সত্তার সাথে যুক্ত আছে এবং যা শ্রবণ করা সম্ভব নয়। আর মুসহাফের মধ্যে যে শব্দমালা রয়েছে, তা সৃষ্টি। সুতরাং সেই অনাদি-অবিনশ্বর ও চিরন্তন অর্থকে সৃজিত শব্দমালার সাথে মিলিয়ে দেয়া লাহুতকে নাসুতের সাথে মিশিয়ে দেয়ার মতই। ঈসা আলাইহিস সালামের ব্যাপারে খৃষ্টানরা এ কথাই বলেছে। প্রিয় পাঠক! আপনি নাসারাদের সাথে তাদের সাদৃশ্যের এ বিষয়টির প্রতি ভালো করে খেয়াল করুন। এতে আপনি দেখতে পাবেন যে, আল্লাহর সত্তার সাথে কালাম

প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং কুরআনকে মাখলুক বলার ধারণা ইসলামের বাইরে থেকে এসেছে।

যারা বলে কালাম এমন অর্থের নাম, যা নফসের সাথেই প্রতিষ্ঠিত, রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীছ তাদের কথাকে প্রত্যাখ্যান করে। তিনি বলেছেন,

إِنْ صَلَاتِنَا هَذِهِ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ

“নিশ্চয়ই আমাদের এ ছলাতের মধ্যে মানুষের কথা বলার কোনো স্থান নেই”।[18] রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِنَّ اللَّهَ يُحَدِّثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ، وَإِنْ مِمَّا أُحْدِثَ أَنْ لَا تَكَلِّمُوا فِي الصَّلَاةِ

“আল্লাহ তা‘আলা যা ইচ্ছা আদেশ করেন, তিনি যেসব আদেশ করেছেন, তার মধ্যে এও রয়েছে যে, তোমরা ছলাতের মধ্যে কথা বলো না”।[19]

আলেমদের সর্বসম্মতিক্রমে ছলাত আদায়কারী যদি ছলাতরত অবস্থায় কথা বলে, তাহলে তার ছলাত বাতিল হয়ে যাবে। তারা আরো একমত হয়েছেন যে, ছলাত অবস্থায় ছলাত আদায়কারীর অন্তরে দুনিয়াবী বিষয়াদির প্রতি যেসব চিন্তা ও কল্পনা থাকে যেমন কোনো কিছুকে সত্যায়ন করা কিংবা উহা থেকে কোনো কিছু কামনা করা, তা ছলাত বাতিল করে দেয় না। তবে জবানের মাধ্যমে ঐগুলো উচ্চারণ করলে ছলাত বাতিল হবে। সুতরাং মুসলিমদের ঐক্যমতে মনের কল্পনা-জল্পনাকে কালাম বা কথা বলা হয় না।

হুহীহ বুখারী ও মুসলিমে নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لَأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ تَكَلِّمْ»

“আল্লাহ তা‘আলা আমার উম্মতের মনের কল্পনা বা ধারণাগুলো মাফ করে দিয়েছেন। যে পর্যন্ত না সে কাজে পরিণত করবে অথবা বাক্যে ব্যবহার করবে”।[20]

এতে সংবাদ দেয়া হয়েছে যে, মনের কল্পনাকে আল্লাহ তা‘আলা ক্ষমা করে দিয়েছেন। যতক্ষণ না কথা বলা হয় অথবা মনে কল্পনাকে কার্যে পরিণত করা না হয়। সুতরাং মনের কল্পনা এবং প্রকৃত কালামের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তিনি আরো সংবাদ দিয়েছেন যে, কথা বলা না হলে মনের কল্পনার কারণে শাস্তি দেয়া হবে না। অর্থাৎ জবানের মাধ্যমে উহা উচ্চারণ না করা হলে। এটি আলেমদের ঐক্যবদ্ধ মত। সুতরাং জানা গেল যে, আরবী ভাষায় এটিকেই কালাম বলা হয়। কেননা শরীয়াত প্রবর্তক আমাদেরকে কেবল আরবদের ভাষায় সম্বোধন করেছেন। সুন্নাহের কিতাবসমূহে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, মুআয রাঈয়াল্লাহু আনহু বলেন,

«يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ؟ فَقَالَ: وَهَلْ يَكُفُّ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى مَنَاحِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ السِّنَنِهِمْ»

“ইয়া রসূলাল্লাহ! আমরা যেসব কথা বলি, তার কারণেও কি আমাদেরকে পাকড়াও করা হবে? তিনি বললেন, মানুষকে কেবল তাদের জবানের অসংযত কথা-বার্তার কারণেই নাকের উপর উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে”।[21]

সুতরাং রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, জবানের উচ্চারণের মাধ্যমে কেবল মানুষের কালাম

হয়। القول এবং الكلام শব্দ দুটি এবং তা থেকে فعل ماضي (অতীত কালের অর্থপ্রদানকারী ক্রিয়া), فعل مضارع (বর্তমান-ভবিষ্যৎকালের অর্থপ্রদানকারী ক্রিয়া) اسم فاعل (কর্তাবাচক বিশেষ্য) এবং আরো যেসব শব্দ নির্গত হয়, সেগুলোকে কুরআন, সুন্নাহ এবং আরবদের পরিভাষায় তখনই কালাম বলা হবে, যখন তার শব্দ ও অর্থের সমন্বয়ে গঠিত হবে। ছাহাবী এবং উত্তমভাবে তাদের অনুসারীদের মধ্যে কালাম সম্পর্কে কোনো মতভেদই ছিল না। পরবর্তীকালের বিদ্বান আলোচকদের মধ্যেই এ নিয়ে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। অতঃপর তা ছড়িয়ে পড়েছে।

সুতরাং কথা, কালাম এবং অনুরূপ অন্যান্য বিষয়ে কবির কবিতা দিয়ে দলীল পেশ করার কোনো প্রয়োজন নেই। এগুলো এমন বিষয়, যেগুলো পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী কালের লোকেরা তাদের কথা-বার্তায় অহরহ উচ্চারণ করে থাকে। এগুলোর অর্থ তারা জানতে পেরেছে। যেমন তারা মাথা, হাত, পা, আসমান, যমীন, পানি, পাহাড় এবং অনুরূপ ইত্যাদির অর্থ জানতে পেরেছে। সুতরাং এগুলোর নতুন এবং যুক্তিবাদী ব্যাখ্যা দিতে গেলে সহজ বিষয়গুলো আরো জটিল হয়ে যাবে।

যে ব্যক্তি বলল, আল্লাহর কালামের অর্থ মাত্র একটি, তা তার পবিত্র সত্তার সাথে যুক্ত রয়েছে এবং কারীর কণ্ঠে মুসহাফে লিখিত ও সংরক্ষিত কুরআনের যে তেলাওয়াত শুনা যায়, সেটি কেবল আল্লাহর কালামের হেকায়াত মাত্র এবং এটি সৃজিত জিনিস, সে মূলতঃ কুরআনকে মাখলুকই বলল। অথচ সে এটি জানতেই পারেনি। কেননা আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا

“হে নাবী তুমি ঘোষণা করে দাও, সমস্ত মানব ও জিন যদি এ কুরআনের অনুরূপ রচনা করে আনয়নের জন্য জড়ো হয় এবং তারা পরস্পরের সাহায্যকারী হয়; তবুও তারা কখনো এর অনুরূপ রচনা করে আনতে পারবে না”। (সূরা বনী ইসরাঈল: ৮৮)

আপনি কি মনে করেন, এখানে আল্লাহ তা‘আলা সে কালামের দিকে ইঙ্গিত করেছেন, যা তার নফসের সাথে প্রতিষ্ঠিত আছে? না কি এমন কালামের দিকে যা মানুষ পাঠ করেছে এবং যা শুনা যাচ্ছে? কোনো সন্দেহ নেই যে, এখানে এ তেলাওয়াতকৃত ও শ্রুত কালামের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা আল্লাহর নফসের সাথে যা প্রতিষ্ঠিত আছে, তার দিকে ইঙ্গিত করা অসম্ভব, তা নাযিলও হয়নি, তা তেলাওয়াত করা হয়নি এবং তা শুনাও যায়নি।

আল্লাহ তা‘আলার বাণী: لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ “তারা এর অনুরূপ রচনা করতে পারবে না”। আপনি কি মনে করেন আল্লাহ তা‘আলা এ কথা বলেছেন যে, আমার নফসের মধ্যে যে কালাম আছে এবং যা তারা শুনে নি ও জানেনি তা তারা কখনো রচনা করতে পারবে না? আসল কথা হলো আল্লাহর নফসের মধ্যে যা আছে, সে পর্যন্ত পৌঁছা কোনো সৃষ্টির পক্ষে সম্ভব নয় এবং তা জানাও কারো পক্ষে অসম্ভব।[22]

এখন তারা যদি বলে উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা কেবল তার নফসের মধ্যকার কালামের বিবরণ ও ব্যাখ্যার দিকে ইঙ্গিত করেছেন, যা কারীগণ লিখিত মুসহাফ থেকে তেলাওয়াত করেছে এবং যা শুনা যাচ্ছে। আর তার সত্তার সাথে যে কালাম যুক্ত আছে, তার দিকে ইশারা করা সম্ভব নয়। যারা এ কথা বলল, তারা আসলে সুস্পষ্টভাবেই কুরআনকে মাখলুক বলল। শুধু তাই নয়; এ কথা বলার কারণে তারা মুতাযেলাদের চেয়ে বড় কাফের হিসাবে গণ্য হবে।[23] আল্লাহর কালামকে তার অনুরূপ ও সদৃশ শব্দ দ্বারা বর্ণনা করা করা হয়েছে, এ

কথা বলার মাধ্যমে সুস্পষ্ট ঘোষণা হয়ে যায় যে, আল্লাহর সমস্ত সিফাতই কেবল হেকায়াত (বর্ণনা করা) স্বরূপ।

কুরআনের এ তেলাওয়াতগুলো যদি আল্লাহর কালামের বর্ণনা হয়ে থাকে, তাহলে তারা আল্লাহর কালামের অনুরূপ কালাম রচনা করতে পারতো। সুতরাং এর অনুরূপ একটি কুরআন রচনা করাতে তাদের দুর্বলতা কোথায়? তাদের কথা মতে আরো আবশ্যিক হয় যে, আল্লাহর কালাম এমন আওয়াজ ও অক্ষরের মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে, যার আদৌ কোনো আওয়াজ ও অক্ষর নেই।

আসল কথা হলো পবিত্র গ্রন্থে লিখিত এ সূরা এবং আয়াতগুলোই কুরআন। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ وَادْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

“তুমি চ্যালেঞ্জ করে বলে দাও যে, তাহলে কুরআনের ন্যায় দশটি সূরা তৈরী করে আনয়ন করো এবং আল্লাহ ছাড়া যাকে ইচ্ছা এ কাজে সাহায্য করার জন্য ডেকে নাও। যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো”। (সূরা হুদ: ১৩) আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ

“বস্তুতঃ যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে, তাদের অন্তরে এটা স্পষ্ট নিদর্শন। যালিমরা ব্যতীত কেউ আমার নিদর্শন অস্বীকার করে না”। (সূরা আনকাবুত: ৪৯)

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ

“এটি এমনসব পুস্তকে লিখিত আছে, যা সম্মানিত, উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন ও পবিত্র”। (সূরা আবাসা: ১৩-১৪)

যে ব্যক্তি কুরআনের একটি হরফ পাঠ করবে তার জন্য প্রত্যেকটি হরফের বিনিময়ে দশটি নেকী লিখা হবে। নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«أَمَّا إِنِّي لَا أَقُولُ (الْم) حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ، وَلَا م حَرْفٌ، وَمِيمٌ حَرْفٌ»

“আমি এ কথা বলছি না যে, আলিফ লাম মীম মিলে একটি হরফ। বরং আলিফ একটি অক্ষর, লাম আলাদা অক্ষর এবং মীম আলাদা অক্ষর”। [24] এ কুরআন হাফেযদের অন্তরে সংরক্ষিত রয়েছে এবং তেলাওয়াত কারীদের জবানের মাধ্যমে তেলাওয়াত হচ্ছে।

শাইখ হাফিযুদ্দীন আন নাসাফী রহিমাল্লাহু তার (المنا) নামক কিতাবে বলেন, إِنَّ الْقُرْآنَ اسْمٌ لِلنَّظْمِ وَالْمَعْنَى, “শব্দমালা ও অর্থের সমন্বয়কে কুরআন বলা হয়”। অন্যান্য উসূলবিদগণ একই কথা বলেছেন। আর ইমাম আবু হানীফা রহিমাল্লাহু তার ব্যাপারে বলা হয় যে, তিনি বলেছেন যে ব্যক্তি ছবলাতের মধ্যে ফারসীতে কিরাআত পাঠ করবে, তার ছুলাত বিগুহ্ব হবে। [25]

কিন্তু তার ছাত্র ইমাম মুহাম্মাদ ও আবু ইউসুফের সাথে মত বিনিময়ের পর তিনি এ মত পরিবর্তন করেছেন এবং বলেছেন আরবী পড়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যে ফারসীতে কিরাআত পাঠ করবে, তার ছুলাত হবে না। আলেমগণ বলেছেন, যে ব্যক্তি আরবী ভাষা পরিত্যাগ করে অন্য ভাষায় কুরআন পড়বে, সে এমন পাগল বলে গণ্য হবে, যার চিকিৎসা করা দরকার অথবা নাস্তিক-মুনাফিক হিসাবে গণ্য হবে, যাকে হত্যা করা আবশ্যিক। কেননা আল্লাহ

তা‘আলা এ ভাষায় কথা বলেছেন। কুরআনের শব্দমালা ও অর্থ মিলেই চিরন্তন মুজেনার স্তরে উন্নীত হয়েছে।

ফুটনোট

[16]. চাই তা মানুষের কালাম বা কথা হোক কিংবা আল্লাহ তাআলার কালাম হোক।

[17]. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা ও ঈসা আলাইহিস সালাম মিলে গেছে।

[18]. সহীহ: মুসলিম, নাসাঈ ১২১৮, ছহীহ আবু দাউদ, হাদীছ নং- ৮৬২, ইরওয়া ৩৯০।

[19]. হাসান সনদে ইমাম নাসাঈ এবং অন্যরা হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। দেখুন শাইখ আলবানীর তাহকীকসহ শারহুল আকীদাহ আত-তাহবীয়া, টিকা নং- ১৫৫।

[20]. মুত্তাফাকুন আলাইহি, ইরওয়া ২০৬২

[21]. তিরমিযী। দেখুন মূল কিতাবের টিকা নং- ১৫৭।

[22]. আল্লাহ তা‘আলা কাফেরদের জন্য যে চ্যালেঞ্জ ছুড়েছেন, তা কেবল শ্রমত ও পঠিত কুরআনের অনুরূপ কিছু তৈরী করে আনার জন্যই। তার সত্তার মধ্যে যা আছে, তার অনুরূপ কিছু তৈরী করে আনয়ন করার চ্যালেঞ্জ করেছেন, কোনো বিবেকবান মানুষ এ কথা বলতে পারে না। সুতরাং মানুষ যে কুরআন পাঠ করছে, তাই আল্লাহর কালাম এবং এর অনুরূপ কিছু তৈরী করে আনার জন্যই চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। এটি যদি আল্লাহর কালামের বিবরণ হতো, যা কোনো সৃষ্টির মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে, তাহলে অবশ্যই সে সময়ের কবি ও সাহিত্যিকরা অনুরূপ কুরআন তৈরী করে চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে পারতো। তারা যেহেতু তা করতে পারেনি, তাই বুঝা গেল যে, এটিই সরাসরি আল্লাহর কালাম; তার সত্তার মধ্যে যেই কালাম রয়েছে উহার ব্যাখ্যা বা বিবরণ নয়।

[23]. কেননা মুতাযেলারা কুরআনকে অন্যান্য সৃষ্টির মতই একটি সৃষ্টি বলেছে। আর এরা বলে যে, আল্লাহর সত্তার সাথে প্রতিষ্ঠিত এমন একটি সিফাত রয়েছে, যার নাম কালাম। কুরআন হচ্ছে সে কালামের ব্যাখ্যা অথবা তার হেকায়াত স্বরূপ অথবা রূপকার্থেই কুরআনকে কালাম বলা হয়েছে। উহা আল্লাহর প্রকৃত কালাম নয়। আর আশায়েরা সম্প্রদায়ের লোকেরা বলেছে যে, আল্লাহর এমন সিফাতও রয়েছে, যা হুবহু বর্ণনা করা হয় এবং উহার সাদৃশ্য পেশ করা যায়। কোনো জিনিসের হেকায়াত করা কেবল উহার অনুরূপ বস্তু দ্বারাই অথবা উহার সদৃশ বস্তু দ্বারাই হয়ে থাকে। কে আছে যে, আল্লাহর কালাম বর্ণনা করবে অথবা উহার হুবহু নমুনা পেশ করবে? জিবরীলের কিংবা মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিংবা অন্য কারো পক্ষে আল্লাহর কালামের হুবহু বিবরণ দেয়া অথবা উহার সাদৃশ্য ও নুমনা পেশ করা সম্ভব নয়। কুরআন যদি হুবহু আল্লাহর কালাম না হয়ে উহার হেকায়াত, ব্যাখ্যা কিংবা উহার সদৃশ হতো তাহলে চ্যালেঞ্জ করার কোনো গুরুত্ব ছিলনা। কেননা জিবরীল ও মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর অন্যতম সৃষ্টি। আর এক সৃষ্টির দ্বারা তৈরী কোনো জিনিসের অনুরূপ

জিনিস অন্য সৃষ্টির দ্বারা তৈরী করা মোটেই অসম্ভব নয়।

[24]. ইমাম তিরমিযী হাদীছটি সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন। দেখুন তুহফাতুল আহওয়াযী, হাদীছ নং- ২৮৩৫।

[25]. ইমাম আবু হানীফা রহিমাল্লাহর পুরাতন মত অনুযায়ী কেউ যদি ছবলাতে কুরআনের অনুবাদ পড়ে নেয় সে আরবীতে কুরআন পড়তে সক্ষম হলেও বা না হলেও, তার ছলাত হয়ে যায়। আল্লামা আবু বকর আলজাসাস ইমামের এ মতের পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে বলেন, এ কুরআন পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবগুলোর মধ্যেও ছিল। আর এ কথা সুস্পষ্ট, সে কিতাবগুলোতে কুরআন আরবী ভাষার শব্দ সমন্বয়ে ছিল না। অন্য ভাষায় কুরআনের বিষয়বস্তু উদ্ধৃত করে দেয়া সত্ত্বেও তা কুরআনই থাকে। কুরআন হওয়াকে বাতিল করে দেয় না। (আহকামুল কুরআন, তৃতীয় খণ্ড) কিন্তু এ যুক্তির দুর্বলতা একেবারেই সুস্পষ্ট। কুরআন মজীদ বা অন্য কোন আসমানী কিতাব নাযিল হবার ধরণ এমন ছিল না যে, আল্লাহ তা‘আলা তার নাবীর অন্তরে কেবল অর্থই সঞ্চার করে দিয়েছেন। তারপর নাবী তাকে নিজের ভাষায় বর্ণনা করেছেন। বরং প্রত্যেকটি কিতাব যে ভাষায় এসেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে শব্দ ও বিষয় উভয়টি সহকারেই এসেছে। পূর্ববর্তী যেসব কিতাবে কুরআনের শিক্ষা ছিল। সেগুলোর কোনটির অনুবাদকে আল্লাহর কিতাব বলা যেতে পারে না এবং তাকে আসলের স্থলাভিষিক্ত করাও সম্ভব নয়। আর কুরআন সম্পর্কে বার বার দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হয়েছে তার প্রতিটি শব্দ আরবী ভাষায় ছবছ নাযিল হয়েছে: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ “নিশ্চিতভাবে আমি তা নাযিল করেছি আরবী ভাষায় কুরআন আকারে”। (সূরা ইউসুফ: ২)

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ﴿وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حَكَمًا عَرَبِيًّا﴾ “আর এভাবে আমি তা নাযিল করেছি একটি নির্দেশ আরবী ভাষায়”। (সূরা রা‘দ: ৩৭) আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন, ﴿فَرَأَيْنَا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ “আরবী ভাষায় এ কুরআন বক্রতা মুক্ত করে নাযিল করেছি। যাতে তারা তাকওয়া অর্জন করতে পারে”। (সূরা যুমার: ২৮) এখন কুরআন সম্পর্কে কেমন করে এ কথা বলা যেতে পারে যে, কোনো মানুষ অন্য ভাষায় তার যে অনুবাদ করেছে তাও কুরআনই হবে এবং তার শব্দাবলী আল্লাহর শব্দাবলীর স্থলাভিষিক্ত হবে। মনে হচ্ছে যুক্তির এ দুর্বলতাটি মহান ইমাম পরবর্তী সময়ে উপলব্ধি করে থাকতে পারেন। তাই নির্ভরযোগ্য বর্ণনায় এ কথা উদ্ধৃত হয়েছে যে, এ বিষয়ে নিজের অভিমত পরিবর্তন করে তিনি ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদের মত গ্রহণ করে নিয়েছিলেন অর্থাৎ যে ব্যক্তি আরবী ভাষায় ক্বিরাত তথা কুরআন পড়তে সক্ষম নয় সে ততক্ষণ পর্যন্ত ছবলাতে কুরআনের অনুবাদ পড়তে পারে যতক্ষণ না সে আরবী শব্দ উচ্চারণ করার যোগ্যতা অর্জন করে। কিন্তু যে ব্যক্তি আরবীতে কুরআন পড়তে পারে সে যদি কুরআনের অনুবাদ পড়ে তাহলে তার ছলাত হবে না।